SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

প্রান্তিকের রবীন্দ্রনাথ ও নিরাসক্ত নির্মমের দূত : এক ব্যতিক্রমী পুস্তিকার নিবিড় পাঠ

Pijus Kumar Mondal
Assistant Teacher
Kharinan High School
Purba Bardhaman,West Bengal,India
Email: 2014pijuskm@gmail.com

Abstract: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১খ্রিঃ—১৯৪১ খ্রিঃ) নিরাসক্ত নির্মমের দেশে মহাপ্রস্থান করেছেন— সেও প্রায় আট দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি পাঠকের মোহ-আবরণ আজও রয়ে গেছে। তাঁর সাহিত্যে আপামর সাহিত্যপ্রেমী খুঁজে পেয়েছেন প্রাণের আরাম, মনের শান্তি। তাই সাহিত্যগুলিও কালের প্রবহমানতায় নিত্য সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। সময়ের অনুবর্তনে নতুন নতুন ভাবনায় ভাবিত হয়ে আরও গভীর অনুভবের বিষয় হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যের মালঞ্চ। তিনিও হয়ে ওঠেন সর্বকালে সমভাবে প্রাসঙ্গিক। 'প্রান্তিক' কাব্যটিকে রবীন্দ্রকাব্যধারার এক ব্যতিক্রমী ফসল বলা যেতেই পারে। কবি ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে হতচেতন হয়ে পড়ার দিন-দুই পরে ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। এই কাব্যটিতে কবির সেই হতচৈতন্যলোক থেকে চেতন জগতে প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ের আত্মানুভূতির ভাষারূপ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই নিঃসঙ্গের দেশ, জ্যোতির্ময়লোকের কথা 'প্রান্তিক'-এ বলার প্রয়াস রয়েছে—যা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। বিশ্ববন্দিত সাধকের উপলব্ধি কবি হয়তো শব্দব্রহ্মে রূপদানের চেষ্টা করে গেছেন 'প্রান্তিক'-এর কবিতা থেকে কবিতায়। কিন্তু তাঁর কাছে শুধু দ্যুলোক মধুময় হতে পারে না; তিনি তো ভূলোকেরও কবি।তাই মধুময় হয়ে ওঠে পৃথিবীর ধূলি। 'প্রান্তিক'-এর শেষ দুই কবিতায় মর্ত্যভূমে নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের সম্মুখে সমাসীন হয়ে বজ্রকণ্ঠে শিশুঘাতী, নারীঘাতী শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। শান্তিকামী মানুষের কাছে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন; সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সরিয়ে রেখে। একটি ক্ষুদ্র কাব্যপুস্তিকার ছোটোমাপের কয়েকটি কবিতার মধ্যে এই বৈপরীত্য রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।সমগ্র রচনাটিতে রবীন্দ্রমননের সেই অভূতপূর্ব অনুভব—যা আমাদের বোধ-সত্তার উত্তরণের পথরেখা প্রস্তুত করে তা-ই অনুসন্ধানের প্রয়াস রয়েছে।

Keywords: ভাববীজ, হতচৈতন্যলোক, নিরাসক্ত নির্মম, দ্রাবক-রস, জীবনতত্ত্ব, নবজীবনলাভ, বিশ্বব্যবস্থা, বৈশ্বিক অশান্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রান্তিক' (১৯৩৮) একটি ক্ষুদ্র কাব্য-পুস্তিকা হলেও শ্রেষ্ঠ কাব্য। আমাদের মতো সাধারন পাঠকেরা যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে পড়ি সেভাবে এই কাব্যটি আত্মস্থ করা বেশ মুস্কিলের ব্যাপার। তাই যতই কবির সৎ পরামর্শ থাক, 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে'[১]; 'প্রান্তিক' পড়ার সময় তা উপেক্ষা করাই সমীচীন হবে। কবির অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায় রচিত 'প্রান্তিক'—কাব্যের মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রকাব্যকে বুঝে নেওয়ার একটা সুযোগ হয় বটে; সমগ্রভাবে বেলাশেষের কাব্যকে বোঝার সুযোগ হয়। কারণ 'প্রান্তিক' পড়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাব্যগুলির পাঠ অপরিহার্য হয়ে

ওঠে। রবীন্দ্রজীবনের সমগ্র কাব্য শেষে গোধূলিবেলার কাব্যকে অনুভব করতে হবে। কবির শেষ লেখা রচনাগুলির সঙ্গে পূর্ববর্তী রচনাগুলো পাঠ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, কবির যাত্রা শুরু হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির এক অভিজাত আঙিনা থেকে, শেষ ঘাটে যখন তরী লাগাতে চেয়েছেন তখন সমগ্র পথ হয়ে উঠেছে এক অগম অভিসার; 'প্রান্তিক'-এর কালে এসে। মানুষ সেই পথের দিশা চেতন— ইন্দ্রিয় জগতে পাননি। এ যেন সূর্যমন্ডলে আগুনের ঝড়। শুধুমাত্র লিরিকের ব্যাখ্যা দিয়ে সেই জীবনতত্ত্বে পৌঁছানো কঠিন ব্যাপার।

'প্রান্তিক' কাব্যটি পাঠ করতে গেলে কাব্যটির পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপট অর্থাৎ যে ভাববীজ থেকে কাব্যটি উৎসারিত তা দেখে নিতে হবে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কবি আলমোড়ায় ছিলেন। এখান থেকে ফেরার পরে আগস্ট মাসের দুই তারিখ আন্দামানে অনশনরত বন্দীদের নিয়ে যে সভা হয়েছিল কলকাতার টাউন-হলে সেখানে কবি সভাপতিত্ব করেছিলেন। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই সভার উদ্দেশ্য আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে জনগণের সহনুভূতি-প্রদর্শন ও লীগ-সরকারের হৃদয়হীন মনোবৃত্তি ও আচরণের প্রতিবাদ-জ্ঞাপন।সভাশেষে কবি আন্দামানে রাজবন্দীদের কাছে টেলিগ্রাম করে জানালেন যে, দেশ তাঁদের পিছনে আছে।"[২] পরবর্তী সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনে যান। তখন সবেমাত্র শান্তিনিকেতনে বর্ষা নেমেছে। লালমাটির ভুবনডাঙ্গা মায়াবী রূপ ধারণ করে কবিকে আকর্ষণ করছে।এমন সময় তার মন ব্যাপৃত ছিল বিজ্ঞানবিষয়ক 'বিশ্বপরিচয়', 'ছড়ার ছবি', 'সে' 'খাপছাড়া' প্রভৃতি লেখালেখিতে। শুধু লেখালেখি নয়; সংগীতচর্চাতেও কবির মন খুলে গিয়েছিল। তিনি লিখেছেন 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের বেশকিছু গান— ১)এসো শ্যামল সুন্দর। ২)মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া। ৩) মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে। ৪)আমার যেদিন ভেসে গেছে। ৫)মেঘছায়ে সজল বায়ে মন আমার ইত্যাদি। পরে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান শেষে ২১-শে ভাদ্র ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে কবি কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো সান্ধ্যকালীন আলাপচারিতার মাঝে হঠাৎ একদিন কবি হতচেতন হয়ে পড়লেন। ১০-ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭, বাংলা ২৫শে ভাদ্র ১৩৪৪। হতচৈতন্য অবস্থায় দিন-দুই কাটানোর পর ডা. নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় ইবিসিপ্লাস[৩] রোগ থেকে মুক্তিলাভ করেন।

১০-ই জানুয়ারি গোয়ালিয়র যাওয়ার কথা থাকলেও গেলেন না।এ সময় অসুস্থ অবস্থা থেকে তিনি সবেমাত্র সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বেছে বেছে শিশুদের চিঠিগুলির উত্তর দিচ্ছেন। তাদের ছোট মনের অনেক বড়ো বড়ো প্রশ্নের জবাবদিহি করছেন।আমরা জানি কবি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর আশ্বিনের প্রথম দিকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ডা.নীলরতন সেনের চিকিৎসায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই 'প্রান্তিক' লেখা শুরু করেছেন। এই অসুস্থ অবস্থা থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠাকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন নতুন চেতনা লাভ তথা নবজীবনের সঙ্গে। এই হতচৈতন্যলোক থেকে চেতন-জীবনে ফিরে আসার মধ্যে কবির কী অভিজ্ঞতা হল? কবি অন্তঃস্থলে এমন কী চৈতন্যপ্রবাহের চলচ্ছবি দেখলেন যাকে 'প্রান্তিক'-এর কবিতা থেকে কবিতায় মুক্তি দিতে চাইলেন? মানুষ যা অনুভব করে তার সবটুকু প্রকাশ করতে পারে এমন কোন ভাষা আছে কি? সেই অধরা অথচ ধরা অভিজ্ঞতার কথা কবি প্রকাশ করতে পারছেন না বলেই, কবিতা থেকে কবিতান্তরে সেই একই কথা বলে চলেছেন। আর একথা বলতে গিয়ে কবি সেই চূড়ান্ত বিজন চিতমহলে চৈতন্য বিস্তার করে চিন্তার জগতে প্রবেশ

করেছেন এবং চিন্তাকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "কবি যেন এক নিশ্বাসে নিদারুন অভিজ্ঞতা বলিয়া ফেলিয়া মুক্তির স্বচ্ছন্দ অনুভব করিতে চান। আবার অল্প সময়ের মধ্যে রচিত বলিয়ায় যেন কবিতাগুলি এক ছাঁচে ঢালাই হইবার সুযোগ পাইয়াছে"।[৪] তাই 'প্রান্তিক'-এর কবিতাগুলির কোন নাম দেননি। 'বলাকা' কাব্য সম্পর্কে কবি স্বয়ং বলেছেন, 'বলাকা'-র ভিন্ন ভিন্ন কবিতাগুলির আমি কোন নাম দিতে চাই না। ....এদের চলার ইঙ্গিতেই আমার প্রাণে উড়ে যাবার ব্যাকুলতা আসচে। আমার এই ব্যাকুলতাটি 'বলাকা'-তে বিশেষভাবে ব্যক্ত হলেও আমার সব কবিতাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।"[৫]

'প্রান্তিক'র কবিতাগুলিও অসম্ভব দেখা না দেখা, আলো-আঁধারের অদ্ভুত জগৎ। তাই কবিতাগুলির কোন নাম নেই।এই কবিতাগুলি বুঝতে হলে কবির ফেলে আসা জীবন, যে বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে —সেখানে পৌঁছতে হবে। সেই অসম্ভব চৈতন্যপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে তিনি যা উপলব্ধি করেছেন অথবা করেননি, তা কি হয়েছে আমরা কেউই জানিনা—সেই আগুনে বিস্তারী চলাচল উপলব্ধি করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা যা ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছিল বা লঘু হয়ে যাচ্ছিল— সেই অসম্ভব কথাকে লেখা অত সহজ ছিল না। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ তার যাবতীয় অন্তর্গত সত্তা নিয়ে যেন পূর্ববর্তী থেকে আরও বড়ো হয়ে উঠলেন। 'প্রান্তিক'-এর কবিতায় নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্বের কথা বলে আরো অনেক উচ্চতায় পৌঁছালেন।

রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকে আপন, পর, আত্মীয়-পরিজনের মৃত্যু খুব কাছ থেকে দেখেছেন। রবীন্দ্র জীবনে মৃত্যুর-আঘাতের একটি তালিকা দেওয়া হল—

সাল (ইং)	মৃত স্বজনের নাম	কবির সহিত সম্পর্ক
১৮৭৫ খ্রিঃ	সারদা দেবী	কবি-মাতা
১৮৮৪ খ্রিঃ	কাদম্বরী দেবী	কবির নতুন-বৌঠান/দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী
১৯০২ খ্রিঃ	মৃণালিনী দেবী	কবি-পত্নী
১৯০৩ খ্রিঃ	রেণুকা দেবী	কবির দ্বিতীয় কন্যা
১৯০৫ খ্রিঃ	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবি-পিতা
১৯০৭ খ্রিঃ	শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবির কনিষ্ঠ পুত্র
১৯১৮ খ্রিঃ	মাধুরীলতা দেবী	কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা
১৯২৬ খ্রিঃ	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবির বড়ো দাদা
১৯৩২ খ্রিঃ	নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবি-ভাইপো/ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৪র্থ পুত্র

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কবি জানতে পারলেন মৃত্যু কী? মানুষ শস্যের মতো জন্মায় আবার শস্যের মতো মরে। কিন্তু তিনি নিজে তা জানেন না। অথচ যে শূন্যতা রেখে যান তা অমোঘ। তবে মৃত্যু আছে বলেই জীবন এত সুন্দর। মৃত্যু আছে বলেই সকলেই চরিতার্থতার দিকে ছুটে যায়।

কিন্তু 'প্রান্তিক'-এর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ সেসব মৃত্যু ছিল অপরের

নিষ্ক্রমণ দেখে তা হৃদয়ে অনুভব করার ব্যাপার। তাই সব মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থেকে প্রান্তিকের অভিজ্ঞতা আলাদা। নিজের শরীরী ব্যাথার দ্রাবক রসের শীর্ষদেশে গিয়ে নিজের মৃত্যু-অনুভবের কথা দিয়ে লেখা। এখানে কবি হতচৈতন্যলোকের হিমগ্নশীতলতাকে স্পর্শ করে ফিরে এসেছেন। তাই অন্য সকল অভিজ্ঞতার থেকে তার এই অভিজ্ঞতার তরঙ্গও বেশি। মৃত্যুর হিমগ্নতাকে স্পর্শ করে তিনি অজানা নীড়ের ভাষা লক্ষ করেছেন অথবা করেননি। বুঝেছেন অথবা বোঝেন নি। যা মৃত্যু নয়, আবার জীবনও নয় অথবা দুই-ই! রবীন্দ্রনাথ চেতনায় ও চেতন-জীবনের জৈবিকতায় ফিরে, বলা যেতে পারে মানবলীলার মধ্যে এসে সেই দেখা না দেখা, জানা না জানা, বোঝা না বোঝা অভিজ্ঞতার কথা বলতে চেয়েছেন। মৃত্যু নয় বলেই 'প্রান্তিক'-এ মৃত্যুর দিকে যাওয়ার কথা, হতচৈতনলোকের কথা আছে। কোথাও মৃত্যুর নেতিবাচকতা নেই। সুতরাং সেখানে আছে এক গভীর অনুভব, সুগভীর সূচিজ্ঞেয়তাজনিত প্রশান্তি, যেখানে মৃত্যু নামক অন্ধকারের মধ্যে আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠবে। সেই অনন্তের পথের যাবতীয় শূন্যতা অথচ সেই শূন্যতার ভিত্তির যে মায়াময় মৃত্তিকা তা হয়তো তথাকথিত ধূলি নয় সেই মায়াময়কে স্পর্শ করার বোধ চরিতার্থতা লাভ করেছে। শূন্যতার মধ্যে পূর্ণতা, রিক্ততার মধ্যে প্রাপ্তির বোধ এক ধরনের প্রশান্তি এনে দিয়েছে।তাই 'প্রান্তিক' পাঠের যে অনুভব তা মৃত্যু নয়, জীবনের পূর্ণতায় যাওয়ার বোধ; বোধের উত্তরণের পথরেখা।

আগে অনেকবার মৃত্যুর ঘটনা কবি লক্ষ্য করেছেন। সহ্য করেছেন অনেক শোক। কিন্তু যে অসুস্থতাজনিত বোধ থেকে 'প্রান্তিক' কাব্য লিখেছেন তা অনন্য। যে হতচৈতন্যলোক থেকে কবি নতুন জীবনে ফিরে এলেন সেই লোকের কথা অন্য কেউ কখনো, কোথাও বলেছেন কিনা সন্দেহ আছে। এরপর তিনি কেবল কবিতা এবং কাব্যই রচনা করে গেছেন। অন্যান্য রচনা বিশেষ লেখেননি। এ সময় তিনি বহির্জীবন থেকে অন্তর্জীবনে— অবচেতনার মধ্যে নেমে যাচ্ছেন। এই 'প্রান্তিক' কাব্য থেকেই নিজ চেতনার অন্তর মন্থন করে বাস্তবকে দেখার সূচনা হয়। তাই 'ল্যাবরেটরি'-র মতো গল্প লেখা সম্ভব হয়েছে। এখন তাত্ত্বিক দার্শনিক কবির মনে নাচিকেত প্রশ্ন জেগেছে। কবি মৃত্যুর কথা আগেও বলেছেন কিন্তু এখন মৃত্যু দূতের পায়ের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন— যা পূর্বে কখনও পাননি। কবি-শিল্পী-দার্শনিক সকলেই মৃত্যুকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। অনেক সাহিত্য লিখেছেন; কিন্তু এই অনুভূতির কথা আর কেউ বলেননি।

সৃষ্টির জগতে মৃত্যুকে পাওয়া, নীলিমার গাঢ়তার মাঝে শ্যামকে পাওয়া (ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি) বজায় থাকে না—নতুন বৌঠানে মৃত্যুতে। 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলিতে তাই মৃত্যু থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। এই গাছ, মাটি, পৃথিবীর বয়ে যাওয়া হওয়া যতক্ষণ জীবন আছে আমি এরই অংশ। একজন কবির মৃত্যোর্ত্তীর্ণ আকাঙ্ক্ষা," মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"[৬]। এত কিছুর পরেও একদিন গোধূলি নেমে আসে, নামে সন্ধ্যা; জীবনের অর্থ এমনই। "ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে/বেঁধেছিস বাসা"[৭]—এ ভাবনা শুধু কবির নয়, আমাদের সকলেরই নির্জ্ঞান মনের স্তরে মৃত্যুর অনিবার্য পদধ্বনি আছে।

যেহেতু মৃত্যুর বীজ নির্জ্ঞান মনে রয়েছে তাই মৃত্যুকে পরাজিত করে অমরত্ব লাভের প্রয়াস মানুষের চির আকাঙ্ক্ষিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে দেখি শশী সূর্যাস্তের গোধূলি বেলায় টিলার উপর দাঁড়িয়ে রাঙা সূর্যকে দেখে মনে করেছে

সে যা করেছে আর যা করতে হবে— এই ভাবনার মধ্যে পরবর্তী সময়ে শ্বাস ছাড়ার অবকাশ টুকু মেলেনা। আসলে মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার আকুলতা সব মানুষের আছে। কবির যখন ৩১ বছর বয়স তখন 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'প্রতীক্ষা' কবিতায় একই কথা বলতে চেয়েছেন—"তবে মৃত্যু, দূরে যাও,এখনি দিয়ো না ভেঙে/এ খেলার পুরী;/ ক্ষণেক বিলম্ব করো, আমার দু-দিন হতে/করিয়ো না চুরি"। 'চিত্রা'-য় বলতে চেয়েছেন জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য চিরকাল নীরব হয়ে আছে। তেমনই 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থের 'জীবন' ও 'মৃত্যু'কবিতায় একই কথা বলেছেন— "জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা/যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।"[৮]এরপর কবির বয়স হয়েছে। ভারতীয় শাস্ত্রে বানপ্রস্থ নেওয়ার সময় এসেছে। ঠিক এরই আগে 'খেয়া'-র কবিতাগুলি এবং পরেই 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য'-র কবিতাগুলি লেখা। জীবন-মৃত্যুর দোলায় দোলায়িত কবি মৃত্যুর শেষ খেয়া পাড়ি দেওয়ার কবি সুলভ ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন। আর এই বিদায়ের সুর বিশেষভাবে ধ্বনিত হয়েছে 'প্রান্তিক', 'আরোগ্য', 'রোগশয্যা', 'শেষলেখা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। 'পূরবী'-তে শেষ রাগিনীর বীণ শুনে কবির মনে হয়েছিল মৃত্যুর দিন চলে এসেছে। তবে 'বলাকা'র চলমান জীবনের কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। 'পূরবী'তে যে নিত্যতা ও অনিত্যতা, বিশ্বসংসারের দুইরূপ ধরা আছে—এই দুইয়ের মিলনই পূর্ণতা। ব্যক্তি মানুষ চলে যায় কিন্তু চলমান জীবনধারা থেমে যায় না। এই চলমান বস্তুজগৎ ও সজীব বিশ্ব ক্রমাগত বদলের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে। এ তো এক নিরবিচ্ছিন্ন বহমান প্রক্রিয়া। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কবি 'শেষসপ্তক' কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন," আমি মৃত্যু রাখাল/সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি/ যুগ হতে যুগান্তরে..."[৯]। কিন্তু'প্রান্তিক'-এর অনুভূতি পূর্ববর্তীকালের উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রত্যক্ষ, কায়িক, জৈবিক মৃত্যুর অতীত এক অভিজ্ঞতা তিনি হতচৈতন্যলোকে লাভ করেছিলেন, তাকে বুঝেছেন, চিনেছেন কিন্তু প্রকাশ করতে পারছেন না। তাই একের পর এক কবিতায় সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

'প্রান্তিক' কাব্যের কবিতাগুলি নিবিড় পাঠের আগে কয়েকটি বিষয় জেনে নেওয়া আবশ্যক—কাব্যটি আকারে ছোটো। মোটামুটি স্বল্প সময়ে লেখা ১৮টি ছোটো মাপের কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি ২৫-শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৫-শে ডিসেম্বরের মধ্যে লেখা; ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি সনেট না হলেও সনেটকল্প কবিতা। আকারে ক্ষুদ্র, প্রকারে সংহত আর একইভাবের ধারাবাহী। ১-১৩ সংখ্যক কবিতা এবং ১৭-১৮ সংখ্যক কবিতা একই সময়ে লেখা। ১৪, ১৫, ১৬ সংখ্যক কবিতা আগের লেখা এবং এই পুস্তিকায় সংকলিত।

'প্রান্তিক'-এর ১ম কবিতায় 'বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে', হতচৈতন্যলোকে গিয়ে কবি লক্ষ করেন বিধাতার দ্বারা সৃষ্ট জীবননাট্য। জীবনের 'দিগন্ত-আকাশে' 'সূক্ষ্ম ধূলি স্তরে স্তরে' ছড়ানো ছিল। আসলে রবীন্দ্রনাথ অজস্র লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, সাহিত্যের এমন কোন মাধ্যম নেই যেখানে তিনি প্রবেশ করেননি। তাই অস্তিত্বের নানামহলে তঁর জবাবদিহি। এছাড়া দীর্ঘ ৭৭ বছরের জীবনে ইন্দ্রিয়ের শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যথার দ্রাবক রসে' চলছিল নিঃশব্দে মার্জনা। ঠিক তখনই 'শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী' এসে অন্ধকারের নাড়ীতে জ্যোতির্ধারা প্রবাহিত করে দিল। তারপর যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন তা পূর্বে কেউ কখনো করেননি। আলো-অন্ধকার, চেতন-অচেতনের দ্বন্দ্ব ভুলে তিনি দেহটাকে জৈবিক অস্তিত্বের বাইরের জগতে

'বিন্ধ্যগিরিব্যবধানসম' মনে করেছেন। আজ কবির দেহ প্রভাতের অবসন্ন মেঘের মত—যা জৈবিকতা উত্তীর্ণ বোধের জগতে পৌঁছে দেয়। এই জৈবিক অস্তিত্ব বিলয়ের মধ্যে দিয়ে নতুন জীবন লাভের দ্বার উন্মুক্ত হবে। জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপ্ততার মাঝেই আমাদের ক্ষুদ্র-জীবন। জৈবিক আহার-নিদ্রা-মৈথুনের জীবন। মৃত্যুই এই জীবনের অচরিতার্থতা থেকে 'অলোক আলোকতীর্থে' নিয়ে যাবে বলে কবি মনে করেছেন।

২নং কবিতায় কবি মনে করেছেন কামনা-বাসনার আবর্জনা, যা সারাজীবন ধরে আমরা জমিয়ে তুলি ভিক্ষুকের মত—এগুলির বর্জনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কবি চান উঞ্ছবৃত্তি-সঞ্চিত জীবনে মরণের প্রসাদবহ্নি এসে জ্বালিয়ে দিক এই কলঙ্ক রাশি। আমাদের তথাকথিত সঞ্চয় বিসর্জন দিলে "রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে।"[১০] মৃত্যুরূপ হুতাসনে সব দগ্ধ হয়ে গিয়ে মর্ত্য-প্রান্তপথ অপূর্ব উদয়াচলজুড়ে গিয়ে পৌঁছাবে বলেই কবির ধারণা।

৩নং কবিতায় কবির দৃষ্টি গেছে অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে, 'নিরাসক্ত নির্মমের পানে'। আমাদের এই জীবনের, সত্যকার পরিচয় আমরা পাইনা। হতচৈতন্যলোকে কবি মহা-একা হয়ে পড়েছেন; তা মহা-একাকীর দেশ। আমাদের সমাজ, চারপাশের পরিবেশ অপরের সাপেক্ষতায় বিচার্য। কিন্তু সৃষ্টিজগতে স্রষ্টা সম্পূর্ণ একা। তাই কবি বুঝলেন পুরনো অভ্যাসের মলিন জীর্ণতা ত্যাগ করে নতুন জীবনচ্ছবি রচনা করতে হবে। হতচৈতন্যলোকে জৈবিক অস্তিত্ব যখন নষ্ট হয়ে গেছে, তখন কবির মনে এসেছে জন্ম ও মৃত্যু মিলিয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন জীবনচ্ছবি।

৪নং কবিতায় কবি বলেছেন যে সংসার-জীবন বানিয়ে তোলা। ব্যক্তির অন্তর্গত সত্তা অবলুপ্ত থাকে বিচিত্রের বহু হস্তক্ষেপে। এখানে আমাদের অবস্থান ললাটে পণ্যের ছাপ নিয়ে। কিন্তু সব বেচাকেনা ফেলে আরতিশঙ্খের ধ্বনি বাজলেই মৃত্যুর নীরব সংগীত মন্দিরে যেতে হবে; একাকীর একতারা হাতে করে। এই অবলিপ্তপরিচয়, দ্বীপধূমে কলঙ্কিত জীবন ফেলে সেই 'শুকতারানিমন্ত্রিত আলোকের উৎসবপ্রাঙ্গণে' কবি যেতে চেয়েছেন।

৫নং কবিতায় কবিকে অকৃতার্থ অতীত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা নিয়ে পিছনে টানছে। তাই কবির আকুতি—

"পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা---
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।"

সবকিছুকে পিছনে ফেলে চিরকালের প্রাণের বাণীর যে সুর চির পথিকের বাঁশিতে বেজেছে— যা বলাই[১১] রক্তের মধ্যে কিম্বা তারাপদ[১২] বৃষ্টির শব্দের মধ্যে পেয়েছিল; কবি তার অনুগামী হতে চেয়েছেন।

৬নং কবিতায় কবি হতচৈতন্যের নিদারুণ অবস্থা থেকে চেতন জীবনে ফিরে আসাকে অভিনন্দিত করেছেন। কারণ বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি কবির নয়; সহস্র বন্ধনের মাঝেই কবি থাকতে চেয়েছেন। এই চেতন-জীবনে থেকেই তাঁর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা উৎসারিত হয়েছে। এ বিশ্বের সামান্যতম জিনিস থেকেও তা উৎসারিত—

"দলে দলে প্রজাপতি রৌদ্র হতে নিতেছে কাঁপায়ে
নীরব আকাশবানী শেফালির কানে কানে বলা,

তাহারি বীজন আজি শিরায় শিরায় রক্তে মোর
মৃদু স্পর্শে শিহরিত তুলিছে হিল্লোল।"

এই পৃথিবী ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। শেষ সমাসন্ন। এই বর্ণ, গন্ধ ও সৌরভের স্মৃতি বিজড়িত ভূমি ছেড়ে তিনি চলে যেতে চান। তবে তাঁর কোন বেদনা যেন না থাকে। কিন্তু সত্যিই কি কোন বেদনা থাকে না? যখন তিনি দ্বিতীয় স্তবকে বলেন—

"হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।"

কবি তো জানেন জীবন ও মৃত্যু মিলিয়েই জীবনের সমগ্রতা।তবে কেন বেদনার স্পর্শ লেগে আছে আজ— "কেনরে তোর দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?"[১৩] 'বলাকা'র ৪৩ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন—

"সন্ধ্যা হল,ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।
যাবার বেলা মুখ ফিরায়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু ,..."

আসলে সেসব ছিল কবিতা। তখনও মৃত্যুকে সামনে দেখেননি। দার্শনিকের মতো তাত্ত্বিক দিক থেকেই দেখেছিলেন। আজকে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে মৃত্যুকে দেখেছেন। তাই সেই নবজীবনের আগে মর্ত্যমানবের কাছে কবির আর্তি 'সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি' —ঘোষণার পরে তাকে যেন মনে রাখতে পারি চিরকাল।

৭নং কবিতায় প্রথমেই আমাদের জাগতিক কামনা-বাসনাকে জীবনের প্রতি 'অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্যপ্রলাপ' বলেছেন। আমাদের কাছে না—পাওয়াটাই বড়ো। যা পেয়েছি তা বড়ো নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো বিরাট হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত। সবটা মিলিয়ে কবি তাই নিজের জীবনকে ধন্য বলেই মনে করেছেন। এই জীবন কবিকে অনেক বেশি বেদনা দিয়েছে। কিন্তু তিনি নীরবে সেই বেদনার পাহাড় অতিক্রম করেছেন। কবি বলেছেন, "খেলায়েছি দুঃখনাগিনীরে ব্যথার বাঁশির সুরে।" এক অনির্দ্দেশ্য বেদনায়, বুকের শোনিত স্রোতে যত রক্তক্ষরণ হয়েছে ততবার মানুষীর ছবি এঁকেছেন। কিন্তু জীবনের খেলাঘরে সবই সময়ের অনুবর্তনে মুছে যায়। ঠিক তেমনিভাবে মানুষীর ছবি যতবার একেঁছেন ততবার মুছে গেছে শিশিরজলে। পুরনো চিহ্ন নতুনের আহবানে মুছে যাওয়াটা-ই স্বাভাবিক। সেজন্য কবি মৃত্যুকে নতুন জীবনে প্রবেশ বলেই মনে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতে সৃষ্টি বা ধ্বংস বলে কিছু নেই; সবই রূপান্তরমাত্র। মৃত্যু যে শুধু অজানা তা নয়; এই জীবনও কম অজানা নয়। জীবনের মধ্যে যা আছে তা কবির কাছে বিপুল বিস্ময়ের। তাই মৃত্যুকে পেরিয়ে গিয়ে কবি জীবনের সার্থকতাকে লাভ করতে চান—

"হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রার।"

কিন্তু এই অস্তিত্বের সারথি কে? যিনি কবিকে নবতর বিজয় যাত্রায় নিয়ে যাবেন।' সোনার তরী'র "ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?"[১৪] বলে যাকে সম্বোধন করেছেন সে? নাকি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-য় কবিকে যিনি তরীতে স্থান দিয়েছিলে। আমরা জীবনে বহুবার

ব্যর্থ হয়েও সেই অস্তিত্বের সারথির ভয়ভাঙ্গা নায়ে চড়ে মারের সাগর পাড়ি দিই। কিন্তু কবিও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অন্ধকার যেখানে আলোর অধিক হয়ে ওঠে সেখানে যেতে চেয়েছেন।

৮নং কবিতা থেকে কবির ভাবনা মোড় ফিরেছে। ভয়ভাঙ্গা নায়ে জীবন পাড়ি দিতে গিয়ে দেখেছেন, আমরা সংসারের রঙ্গমঞ্চে বাস করি। ফলে আমাদের সত্য পরিচয় অবলুপ্ত থাকে। নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য কতরকম ভূমিকা আমাদের গ্রহণ করতে হয়। তা নিরর্থকও বটে। আসলে জীবন যত এগোয় এবং অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত হয়, তত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। প্রতিদিনই আমরা মৃত্যুর চরণে মৃত্যু করে চলি। জন্ম ও মৃত্যু নিয়েই জীবনের এই প্রবাহ অব্যাহত থাকে।

৯ নং কবিতাতেই প্রথম জীবনের অপর পাড়ের কথা কবি বললেন। এপারে জীবন চাঞ্চল্য, ওপারে মৃত্যুর প্রশান্তি। এ কথা তিনি 'চৈতালি'র 'খেয়া' কবিতায় আগেই বলেছিলেন তাত্ত্বিকভাবে। কিন্তু এখন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন মৃত্যু আমাদের কাছে কৃষ্ণরূপে অর্থাৎ কালোরূপে পরিচিত হলেও অরূপতার বৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থিত হয়। এই অভিজ্ঞতার কথা 'তোমার মাঝে আমার প্রকাশ তাই এত মধুর' বলে আগেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 'প্রান্তিক'-র এই কবিতায় আরও নিবিড়ভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে—

"হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ কর তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।"

১০নং কবিতায় কবি মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন। কবির বিশ্বাস যেদিন তিনি জীবনে –মরণে এবং জীবনাতীত অনুভবে কবি বলে পরিচিত হবেন, সেদিন তার কোন বেদনা থাকবে না। সেদিন মৃত্যুর জগতে পরিপক্ক ফলের মতোই নিঃশব্দে খসে পড়বেন—

".....আসিবে আর একদিন যবে
কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি— 'পরে। চরিতার্থ হবে শেষ
জীবনের শেষ মূল, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।"

১১নং কবিতায় 'কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ' থেকে মুক্তির কথা বলেছেন কবি। কারণ মৃত্যুর পর যে অনিশ্চিত লোকে যাবেন সেখানে কোন ঈর্ষা নেই; নেই বাস্তব জগতের খ্যাতির কাড়াকাড়ি।এ জগতের সবকিছু রয়ে যাবে অনামিক স্মৃতিচিহ্ন হয়ে।

১২নং কবিতায় কবি এই সংসারে শেষের অবগাহন সাঙ্গ করতে বলেছেন। মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন ফুল ফোটাবার ঋতু সাঙ্গ হয়ে যায়। জৈবশক্তি ক্ষয় পেলে চিত্তশক্তি প্রকাশ পায়। রিক্ত না হলে নতুন কিছু পাওয়া যাবে না। একটি দিক ছেড়ে গেলেই তো নতুন জীবন লাভ করা যাবে।তাই কবি বলেছেন—

".....; এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি,...."

কবি বলেছেন যে, মৃত্যু এসে তাঁকে শূন্য করে দেবে তা মানা যাবে না। ভূ-লোকের খেলা সাঙ্গ হলে তবেই অধ্যাত্ম্যলোকের খেলা শুরু হবে। কবি জানেন," বোঁটার বাঁধন

থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নবপর্যায়ে তাদের বন্ধনমোচন হয়।তেমনি দেহতন্ত্রে প্রানের আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা বলেই জানব।"[১৫]

১৩নং কবিতায় কবি আরও বলেছেন জন্মক্ষণ তাঁকে পরম মূল্য দিয়েছে। জীবনের কর্মক্ষেত্রে বহু সম্মান এনে দিয়েছে। এখন আত্মার প্রবাহমানতায় সেই অনন্তলোকে চলে যেতে চান। কারণ সেই সামনের দিকে,সম্মুখদিকে চলাই মানুষের ধর্ম।

১৪নং, ১৫নং ও ১৬ নং কবিতা কবি আগে লিখেছেন; 'প্রান্তিক' প্রকাশের সময় জুড়ে দিয়েছেন। ১৪ নং কবিতায় কবি মনুষ্য সমাজে গ্রাহ্য হওয়া, লোক মুখ-বচনের পবনে দোল খাওয়া, কিংবা আজন্ম ভিক্ষাবৃত্তি সাঙ্গ করতে চান। তমিস্রার মধ্যে যে আলো জ্বলে সেখানে কবি যেতে চেয়েছেন। তাই কবি এই প্রাণ পাওয়াকেই ধন্য বলে মনে করেছেন। যদিও কখনো সার্থকতায় কখনও বা অসার্থকথায় কেটেছে এই জীবন। কিন্তু আজকে কান্না না করে কবি এ জন্মের অধিদেবতারে নম্র নমস্কারে বন্দনা করে যেতে চেয়েছেন।

১৫নং কবিতায় কবি মৃত্যুকে নতুন জগতে প্রবেশের পথ বলেছেন। তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়, অভ্যাসের জালে ছিন্ন করে, দূরের পথিকচিত্ত— যা সব মানুষের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তা মুক্তির উল্লাসে পাঠ করেছে মুক্তিমন্ত্র।

১৬নং কবিতায় মৃত্যুর চলমানতায় বিশ্বাসী কবি শরীরী অস্তিত্ববান জীবনে ফিরে এসেছেন। তিনি দেখেছেন বহু কীর্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দর্প, কত জ্ঞানের সাধনা। এমন কোন দিন ছিল না যে তিনি নিজে মনুষ্যত্বের সাধনা করেননি। কিন্তু সময়ের সাপেক্ষেতায় ফিরে যাবার সময় হয়েছে বিহঙ্গের; অথচ সমস্ত মানব সভ্যতা আজ বিপন্ন। মানুষের বাঁচবার সেই নীড়টুকু আজ দিশেহারা। কবি শুনছেন ভৈরবী সাইরেন। সেতারের সুর-তান সব কেটে যাচ্ছে। বিবদমান জাতিগুলির উন্মত্ত আচরণে সমগ্র মানব সভ্যতা আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। চরিতার্থতার বোধে যে নীড় রচনার কথা ছিল, কৃষ্ণ অরুপতার ধ্যান করার কথা ছিল— সেই সময়ে দাঁড়িয়ে চেতনজীবনে কবি এ কোন পৃথিবীকে দেখছেন? সেই পূর্ণতার তান-সাধার দায়কে বৈশ্বিক চেতনায় পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখেছেন আজ সমগ্র মানব সভ্যতা রিক্ততায় পর্যবসিত। সমস্ত পৃথিবীর বেদনা বাঁশির সুরে— যা এলোমেলো ধ্বংসের তালবাদ্যে মূর্ছিত। মানুষের দায়বদ্ধতা ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ সেই দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই দায়বদ্ধতা থেকেই উঠে এসেছে ১৭ সংখ্যক ও ১৮ সংখ্যক কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের লুপ্তিগুহা হতে ফিরে এসে দেখলেন বাস্তব পৃথিবীর অশান্তি আরো বেশি। যে মানুষ জীবনের নানা মহলে পদ সঞ্চার করেন তিনি তো এপারের যাত্রা সমাপ্ত না হলে মুক্তি পাবেন না— এটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মাঝে চির পথযাত্রী। তিনি সমগ্র বিশ্বব্যবস্থাকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর জন্মের সময় থেকে সমকাল পর্যন্ত। তিনি শুধু লক্ষই নয়; পর্যবেক্ষণ করেছেন। দেখেছেন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসান, বুর্জোয়াতন্ত্রের প্রবেশ। জাপানের মতো দেশে ধনতন্ত্রের প্রভাব। এরপর বিংশ শতকে ধনতন্ত্রের শক্তি যতই ক্ষয় পেয়েছে ততই সে নিজ সংকটে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। আর 'প্রান্তিক' লেখার সময়সীমা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সমগ্র বিশ্ব।এ সময় ফ্যাসীবাদের আগ্রাসনে মানব সভ্যতার সংকট উপস্থিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

রক্তপাত ধ্বংস-ধ্বস্ততাকে 'বলাকা'য় রূপ দিয়েছেন। কিন্তু এসব করে মানুষ মানবতার, মানবস্বার্থের সুকৃতির ক্ষতি করেছে বলে কবি ধারণা। তবে মানুষের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। মানবতার ক্ষয় নেই বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। একদিন সব ঝঞ্ঝা কেটে যাবে।মানুষ নিজে মর্ত্যসীমা চূর্ণ করে দেবতার অমর মহিমাকে ধরাতলে নামিয়ে আনবে।১৯২৬খ্রিস্টাব্দে 'রক্তকরবী'তে দেখিয়েছেন নন্দিনী কীভাবে রাজাকে জালের বাইরে নিয়ে এসেছে।তিনি বোঝাতে চেয়েছেন রাজার নিজের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধকে। তখনও কবির বিশ্বাস ছিল গণতন্ত্রের স্বপ্নে। আর এই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই পৌঁছালেন 'সভ্যতার সংকট'-এ।

বিশ্বের এই ভয়াবহ অশান্তির মধ্যে কবি শরীরী ব্যথার দ্রাবক রস ভুলে যেতে চেয়েছেন। সমস্ত মানব সভ্যতা আজ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে এসে পৌঁছেছে। ফ্যাসিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, পররাজ্যগ্রাসীদের অমঙ্গল ধ্বনিতে ধরাতল কম্পিত। মানুষের অপমান তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা জানতে পারি, জার্মানির ফ্যাসিস্ট মেরুদণ্ড হিটলার তখন ছোট ছোট গণতন্ত্রের দেশগুলিকে পদানত করতে চলেছে। আর বড়ো বড়ো শক্তিধর দেশগুলি চুপ করে আছে। কবি এদের ভীরুতা যেমন লক্ষ্য করেছেন তেমনি অন্য দিক থেকে শুনেছেন শয়তানদের নির্লজ্জ হুংকার ধ্বনি। মানুষের মানবিক গুণ আজ ধ্বংস হয়েছে। ১৭ নং কবিতায় লিখেছেন—

"..... দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ ,..."

রবীন্দ্রনাথ তো প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠস্বর বলে বন্দিত হয়েছেন। তাই তাঁর কথা খুবই বাস্তবসম্মত— "আমায় নইলে ত্রিভুবনেরশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে"। সমগ্র বিশ্ব, দেশ তথা মানুষের এমন দুর্দিনে তিনি তো অধ্যাত্মলোকের ধ্যানে মগ্ন থাকতে পারেন না। তিনি নেমে আসেন সাধারণের পথে পা বাড়াতে। তাই এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তিনি মহাকালের কাছে প্রার্থনা করেছেন—

".....মহাকালসিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা—' পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস মানুষ এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জয়ী হবে। অশান্তির মধ্যে দিয়েই তো শান্তিকে লাভ করতে হবে। উগ্রনীতি একদিন 'নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে'। তাই জাপানের আগ্রাসন থেকে চীনের গণতন্ত্রকামী মানুষের জয় কামনা করেন। লেখেন 'আফ্রিকা'-র মতো কবিতা। তাঁর বিশ্বাস এ কাজ যারা করেছে তারা একদিন মানব সভ্যতার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

শেষ কবিতা দুটিতে রচনার তারিখ উল্লেখ করেছেন এইভাবে—

১৭ সংখ্যক- শান্তিনিকেতন॥২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩৭

১৮ সংখ্যক- শান্তিনিকেতন॥খ্রীষ্ট- জন্মদিন॥২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৭

দ্বিতীয়টিতে উল্লেখ করেছেন যিশুখ্রিস্টের কথা। আমরা যেন তাঁকে বিস্মৃত না হই। যীশু তো প্রেমের দেবতা। তাঁর সাম্যবাণী, প্রেম ও মুক্তির কথা অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাঁকে বন্দনা করে গেছেন। তিনি প্রেমের মধ্যে দিয়ে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস আছে যে হিংস্রতার মধ্যে অস্ত্র ধারণ না করে, তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হলেও প্রকৃত সৃষ্টির কাজ করা যায়। তিনি বলেছেন—

"বিনাশের শক্তিই মানুষের ইতিহাসে শেষ কথা হতে পারে না, তাহলে মানুষ বাঁচত না।..... আজকের দিনে এই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে এইই মানুষের আশ্বাসবাণী।"[১৬]

—এই সাহসী কামনা বুকে নিয়ে তিনি ধিক্কার হেরেছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তা কি ব্যর্থ? এই প্রবন্ধেই লিখেছেন—

"দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ ক'রে আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি—এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও সৃষ্টির কাজ। আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু আমাদের মন আছে।"[১৭]

তাই শান্তির ললিতবাণী আজ ব্যর্থতার পরিহাস হয়ে গেলেও ১৮ সংখ্যক কবিতায় কবি মনের জোরে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন—

"বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

শেষ কবিতা দুটি খ্রিস্ট জন্মদিনে লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে পাশ্চাত্যে বড়দিন উৎসব রূপে পালিত হবে অথচ যীশুর সেই বাণী আজ তাদেরই দ্বারা মিথ্যা হয়েছে ।তাই বলেছেন—

"জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গির্জায় গির্জায় তাঁর স্তবধ্বনি উঠছে.....আর সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী ভ্রাতৃহত্যায়।.....লোভ আজ নিদারুণ, দুর্বলের অন্নগ্রাস আজ লুণ্ঠিত,.....আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন"।[১৮]

গানের মাধ্যমে বলেছেন, "একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে/রাজার দোহাই দিয়ে..."। আসলে এই মানব পীড়ণের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জা থেকে জাগ্রত হয়ে আজ মানত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিচ্ছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া"। নিজের স্বার্থপরতা, অহংকার ত্যাগ করতে পারলেই বিশ্ব প্রাণের সারা মিলবে। সুন্দর হয়ে উঠবে পৃথিবী।

রবীন্দ্রনাথ কি জানতেন না নরকাগ্নিগিরিগহ্বর, নরমাংসক্ষুধিত দানবপক্ষীর কুৎসিত হুংকার—এসব কবিতার শব্দ নয়। জানতেন! এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন তীব্র ঘৃণায়।আসলে বড়ো বড়ো শক্তি, যারা মানব সভ্যতার শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে কবি বিষোদ্গার করতে চেয়েছেন। তাই শান্তির ললিত বাণীর ব্যর্থতা স্বীকার করে ডাক দেন সংগ্রামের। একজন ৭৭ বছরের মানুষের কীভাবে বদলে যাওয়া! টলস্টয় এর 'রেজারেকশন' উপন্যাসের নায়কের মতো আমাদের রবীন্দ্রনাথও নতুন অর্থে দেখেছেন এই পৃথিবীর ভয়ংকর রূপকে। যীশুর মত রবীন্দ্রনাথেরও মৃত্যুগুহা থেকে পুনরুজ্জীবন

(পুনরুত্থান) ঘটেছে। তিনি বিশ্বাস করেন অশুভ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে শুভশক্তির জয় ঘোষণা হবে। এই বিশ্বাস দিয়েই শেষ হয়েছে 'প্রান্তিক'কাব্যটি।

আলোচনার শেষে এসে বলা যায় শারীরিক অসুস্থতায় হতচৈতন্য লোকের নিঃসঙ্গ দেশ থেকে ফিরে সেই অজানা অথচ জানা, অচেনা অথচ চেনা জগতের কথা 'প্রান্তিক'-এর কবিতার পর কবিতায় বলতে চেয়েছেন। আর এই কথা বলতে গিয়ে যখন বাস্তব পৃথিবীর দিকে চোখ ফেরান তখন সেখানেও শকুনের নরমাংস ছেঁড়ার কাড়াকাড়ি। ফলতঃ দায়বদ্ধতার সমস্ত ভার মাথায় নিয়ে লিখতে হয় ১৭নং এবং ১৮নং কবিতা। একইসঙ্গে 'প্রান্তিক' কাব্যটি হয়ে ওঠে কবির শারীরিক অসুস্থতা ও বৈশ্বিক অশান্তির বাণীবহ এক অতুলনীয় ও ব্যতিক্রমী কবিতার সংকলন।

Endnotes

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, উৎসর্গ, ২১সংখ্যক কবিতা।
২। মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবন কথা, পৃঃ ২৩৪।
৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১০খণ্ড, পৃঃ ২১৬।
৪। বিশী, শ্রীপ্রমথনাথ, রবীন্দ্রসরণী, পৃঃ৩২০।
৫। সেন, শ্রী ক্ষিতিমোহন, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃঃ ২০।
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কড়ি ও কোমল, প্রাণ, কবি।
৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, প্রতীক্ষা, কবিতা।
৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কণিকা, জীবন, কবি।
৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শেষ সপ্তক, ৩৯ সংখ্যক কবিতা।
১০। বিশী, শ্রীপ্রমথনাথ, রবীন্দ্রসরণী, পৃঃ৩।
১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, 'বলাই' গল্প।
১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, 'অতিথি' গল্প।
১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পূজা, ৬০৮ সংখ্যক, কবিতা।
১৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, 'সোনারতরী', কবিতা।
১৫। মুখোপাধ্যায়, শ্রী প্রভাতকুমার, রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৭।
১৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, 'প্রলয়ের সৃষ্টি', প্রবন।
১৭। ঐ।
১৮। খৃষ্ট, বড়োদিন, প্রবন্ধ, পৃঃ ৪১।

Bibliography

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রান্তিক, বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ১ম সংস্করণ, পৌষ, ১৩৪৪, পুনর্মুদ্রণ, কার্তিক, ১৩৪৬।
- রায়, নীহাররঞ্জন, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২৫বৈশাখ, ১৩৪৮, সপ্তম মুদ্রণ, ১৪২৫।
- মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভরতী, কলিকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭১।
- বিশী, শ্রীপ্রমথনাথ, রবীন্দ্রসরণী, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৯।
- ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১২, ৪র্থ সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৭২।
- মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবন কথা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র, ১৩৬৬।

- বসু, নিতাই, রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, ২০০২খ্রিঃ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১০খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ২য় প্রকাশ, ১৪২০।
- সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, জুন, ২০১০খ্রিঃ।
- সেন, শ্রী ক্ষিতিমোহন, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, এ মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯।

——